ক্যাম্পাসে ছাত্র হত্যা

চাই দোষীদের শাস্তি এবং বুর্জোয়া রাজনীতির বিরুদ্ধে আদর্শবাদী ছাত্ররাজনীতির উত্থান

।। ভ্যানগার্ড প্রতিবেদক ।।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি রাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফারুক হোসেনকে ইসলামি ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসীরা যে ভাবে হত্যা করেছে তাকে বর্বোরচিত বললেও কম বলা হয়। হাত পায়ের রগ কেটে, ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। ফারুক হোসেন গণিত স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তার বাবা একজন ক্ষুদে কৃষক। ছেলের পড়শোনার খরচ দিচ্ছিলেন পরিবারের শেষ সম্বল সামান্য জমিটুকু বন্ধক রেখে, এনজিও'র কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে। এ কারণেও, শুধু নৃশংসতার জন্যই নয়, ফারুকের হত্যাকাণ্ড মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে জামাত-শিবিরবিরোধী বিক্ষোভে যার প্রতিফলন ঘটেছে। ঘটনাটা সরকারের ভেতরেও বেশ প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে বলে মনে হচ্ছে। ঘটনার পরপরই পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) রাজশাহী ছুটে গেছেন। তার পরপরই সেখানে গেছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। যে-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাত্র এক সপ্তাহ আগে, ১ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষের কারণে ফারুকের মতই মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্র আবু বকর খুন হওয়ার পর তাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সে-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই ২৪ ঘন্টার মধ্যে ফারুকের খুনীদের গ্রেফতারের নির্দেশ জারি করেছেন। এবং বলেছেন, মন্ত্রীর আদেশ শিরোধার্য। এ আদেশের পরপরই সারাদেশে শিবির কর্মীদের ঘাঁটিগুলোতে চিরুনি অভিযান শুরু হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের শতাধিক নেতা-কর্মীকে। অনেকে ভাবছেন এবার বোধ হয় জামাত-শিবিরের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া হবে। কিংবা (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে) শিক্ষাঙ্গনকে 'শিবিরমুক্ত' করা যাবে। আসলে কি তা হবে?

আজকে জামাত-শিবিরের যে-সন্ত্রাসী চেহারা সবার মাঝে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে তা নতুন কিছু নয়। গত শতকের '৮০ এর দশক থেকেই আমরা তা দেখে আসছি। তখন থেকেই ওরা রগকাটা-হাতকাটার রাজনীতি শুরু করেছে, খুন করেছে ডজন ডজন ছাত্রকে, হাত কেটে রগ কেটে জীবনের মতো পঙ্গু করে দিয়েছে ততোধিক ছাত্রকে। বহু ঘটনায় সুনির্দিষ্ট মামলাও হয়েছে। কিন্তু একটারও সুরাহা হয়নি। বরং ওরা নানাভাবে সরকার ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। এ অভিযোগের জবাবে বর্তমান সরকারের কর্তাব্যক্তিরা, এবং অতি অবশ্যই তার অনুসারীরা, হয়তো আঙ্গুল তুলবেন জিয়াউর রহমান থেকে এরশাদ হয়ে সর্বশেষ বিএনপি-জামাত জোট সরকারের দিকে। এ সরকারগুলো যে আক্ষরিক অর্থেই দুধ-কলা দিয়ে পুষে জামাত-শিবিরকে বড় করে তুলেছে – এটা একশ' ভাগ সত্য। কিন্তু '৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ কী করেছিল? তখনও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কলেজ শিবিরের দখলে ছিল। সরকার তাতে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। বরং সেই সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল সংগঠনগুলো যখন এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে তখন স্থানীয় অত্যন্ত প্রভাবশালী এক আওয়ামী লীগ নেতা শিবিরকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নামে বিভিন্ন হল ও ভবনের নামকরণ নিয়ে জামাত-শিবিরের তুলকালাম কাণ্ডের কথা নিশ্চয়ই সবার স্মরণে আছে। তখন এটা ওপেন সিক্রেট ছিল যে তৎকালীন আওয়ামী লীগ দলীয় স্পিকার তাদেরকে শক্তি যুগিয়েছেন। উপরন্তু, তখন আওয়ামী সরকারের মন্ত্রীদের কেউ কেউ নামকরণের বিষয়টাকে সরকারকে বিপদে ফেলার চক্রান্ত বলে অভিহিত করেছিলেন। চট্টগ্রামে শিবিরের ব্রাশফায়ারে ৮ ছাত্রলীগ কর্মী খুনের ঘটনা কি তখনই ঘটেনি? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক লাশের বদলে ১০ লাশ ফেলার হুমকি দেওয়া ছাড়া আর কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তখন?

হ্যাঁ, আমরা জানি, শেখ হাসিনা তখন ক্ষমতায় এসেছিলেন জামাতের সহযোগিতা নিয়ে। '৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও জামাত একসাথে না লড়লেও একসাথে বিএনপি সরকারবিরোধী আন্দোলন করেছিলেন। তার ধারাবাহিকতায় জামাত (৯১ সালে বিএনপি'র সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে নির্বাচন করলেও) '৯৬ সালে আলাদা অবস্থানে থেকে নির্বাচন করেছিল। এটা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা পেতে দারুন সহযোগিতা দিয়েছে। এ কারণেই, হয়তো (কৃতজ্ঞতা বা কৌশল যা-ই হোক) আওয়ামী লীগ 'ডোন্ট ডিস্টার্ব জামাত' নীতি অনুসরণ করেছিল।

ইতিহাস-সচেতন সবাই জানেন যে '৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ জামাত-শিবির নামক বিষবৃক্ষটিকে উপড়ে ফেলেছিল। এর পর প্রয়োজন ছিল, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পূর্ণ করা এবং সেক্যুলার মূল্যবোধের বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ওই বিষবৃক্ষের শেকড়-বাকড়গুলো কেটে দেওয়া। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের সরকার সে কাজটি করেনি, বরং গণতন্ত্র ও সেক্যুলার চেতনাবিরোধী কিছু তৎপরতার মাধ্যমে তাকে মাটির উপরেই বাঁচিয়ে রেখেছে। জিয়াউর রহমান এসে ওই বিষবৃক্ষটিকে আবার মাটিতে রোয়ে দেন এবং পরবর্তী প্রত্যেকটি সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একে পুষ্টি যোগায়। পরিণামে, '৭১ এর মৃতপ্রায় জামাত-শিবির দু'দশকের মধ্যে বাংলাদেশের ভোটের রাজনীতিতে একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়, যে কারণে জামাত শুধু বিএনপিই নয় আওয়ামী লীগের কাছ থেকেও ফায়দা আদায়ে সক্ষম হয়।

জামাতকে বাঁচিয়ে রাখার পেছনে অবশ্য শাসকশ্রেণীর সামগ্রিক প্রয়োজনটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করেছে। সমাজ সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন, অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের ধারক হিসেবে তারা যেহেতু প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার উত্থানকে ভয় পায়, সেহেতু তাকে দাবিয়ে রাখার জন্য নানা প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণাকে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়, ক্ষেত্রবিশেষে তার চাষ-বাসও করতে হয়। এখান থেকেই জামাত-শিবিরের মত সভ্যতাবিরোধী শক্তিগুলো পুষ্টি পায়। জামাত-শিবিরের কর্মকাণ্ড, বিবৃতি বা তাদের নেতাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এগুলোর ৯০ শতাংশেরও বেশি বামপন্থি ও সেক্যুলার শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। খুব পেছনে যাওয়ার দরকার নেই, বর্তমানেই তার নজির আছে। যেমন, মহাজোট সরকার সম্পর্কে তাদের প্রধান অভিযোগ হল, এ সরকারকে নাকি বামপন্থিরা খেয়ে ফেলেছে। আজ পর্যন্ত তারা সরকারের বিভিন্ন তৎপরতা সম্পর্কে যত সমালোচনা করেছেন তার প্রায় সবক'টির জন্য তারা দায়ী করেছেন সরকারের ভেতরে থাকা তথাকথিত বামপন্থিদেরকে। তাদের কথার মর্ম হল, আওয়ামী লীগ ঠিক পথেই চলতো, বামপন্থিরাই যত গোলমাল লাগাচ্ছে। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগও কি প্রকৃত অর্থে জামাত-শিবিরকে তাদের শত্রু বলে মনে করে? করলে, যুদ্ধাপরাধের বিচার হচ্ছে না কেন? এখনও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জামাত-শিবিরের লোকেরা টিকে আছে কীভাবে?

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। সেখানকার প্রশাসন ওই ঘটনার পুরো দায় 'জামাত প্রভাবিত' পুলিশের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এটা অনেকাংশে সত্য হলেও, তারা নিজেদের দায় এড়াতে পারেন না। খোদ উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে জামাত তোষণের। ১০ ফেব্রুয়ারি 'কালের

কণ্ঠ' এ বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট করেছে। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই বর্তমান উপাচার্য দায়িত্ব নিলেও এখনও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর প্রশাসনের ৮০ শতাংশ পদ জামাতকর্মী অথবা জামাত-সমর্থকদের দখলে। স্বাভাবিকভাবেই, হলগুলোতে শিবিরের দখলদারিত্বে সামান্যও চিড় ধরেনি। বিভিন্ন হলের নিচতলার রুমগুলো শিবিরের নামে বরাদ্দ ছিল। এসব রুমের অধিকাংশেরই জানালার গ্রিল ভেঙে রাখা হয়েছিল, যেখান দিয়ে জরুরি যাতায়াত শুধু নয় অস্ত্রও আনা-নেওয়া হতো। সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তারা বলেছেন, তারা একাধিকবার হল কর্তৃপক্ষকে এগুলো মেরামত করার তাগিদ দিয়েছেন, কিন্তু তা কানে তোলা হয়নি। এমনকি উপাচার্যের সহযোগী কর্মকর্তাদের কেউ কেউ জামাত সমর্থক বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে উপাচার্যের ব্যাখ্যাটাও চিত্তাকর্ষক। তিনি নাকি 'শান্তির স্বার্থে' সমন্বয়ের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে চেয়েছেন। এ জন্য পুরনো সেট-আপে হাত দেননি। আবারও 'ডোন্ট ডিস্টার্ব জামাত' কৌশল!

আসলে, এটা হল শাসন-শোষণকে নির্বিঘ্ন করার স্বার্থে আপাতবিরোধী শাসকশ্রেণীর দলগুলোর সহাবস্থান নীতিরই প্রতিফলন। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বহু প্রশ্নে আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জামাত-জাতীয় পার্টির মত শাসকশ্রেণীর দলগুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা গেলেও অর্থনীতিতে মুক্তবাজার নীতি অনুসরণ, শিল্প-কৃষি এবং জ্বালানি খাতকে দেশি-বিদেশি লুটেরাদের হাতে তুলে দেওয়া ও গার্মেন্টস শ্রমিক বিদ্রোহ দমন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ওদের মাঝে দারুন ঐক্য দেখা যায়। শিক্ষাঙ্গনেও ওদের অনুসারী ছাত্র সংগঠনগুলোর সম্পর্ক ওই রকম অম্লমধুর। যেমন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলোতে গত কয়েক বছর ধরে একটা বিষয় ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে যে, যখনই কলেজ কর্তৃপক্ষের ফি বৃদ্ধিসহ অন্যায়-অযৌক্তিক কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বা কোনো প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে ছাত্ররা প্রতিবাদমুখর হয় তখনই ছাত্রলীগ-ছাত্রদল-ছাত্রশিবির প্রশাসনের পক্ষ নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ ধরনের ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে বগুড়ার আজিজুল হক কলেজ, জয়পুরহাট সরকারি কলেজসহ বেশ কয়েকটি কলেজে ঘটেছে। এর আগে গাইবান্ধা সরকারি কলেজেও একই চিত্র দেখা গেছে; অর্থাৎ বলা যায়, এমনিতে বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জামাত-জাতীয় পার্টি বা তাদের অনুসারী ছাত্র সংগঠনগুলো মুক্তিযুদ্ধের কথিত পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে পরস্পরের সাথে বাক-বিতণ্ডা চালালেও জনগণের আন্দোলন দমনের বেলায় তাদের মাঝে ওই পক্ষ-বিপক্ষ বোধ কাজ করে না।

এ প্রসঙ্গটা বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই এখানে তোলার কারণ হল জামাত-শিবির বিরোধী আন্দোলনকে সঠিক ধারায় প্রবাহিত করার জন্য শাসকশ্রেণীর দলগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের এ ধরনটা সবারই বিবেচনায় থাকা দরকার। না হলে, এ আন্দোলন অতীতের মত চোরাগলিতে হারিয়ে যাবে। এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির কর্তৃক ফারুক হত্যার পর সরকারের পদক্ষেপ ও শিবির নির্মূলের জন্য চলমান সাঁড়াশি অভিযান সঠিক ও কঠোর বিচার প্রক্রিয়ায় পরিণতি লাভ করবে, এটা সকলের দাবি। কিন্তু, ছাত্র লীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে আবু বকরের নিহত হওয়ার পরও দেশব্যাপী ছাত্রলীগের সন্ত্রাস-দখলদারিত্ব যেভাবে লাগাতার চলছেই, তা শুভ লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে না। সচেতন মানুষরা কেই কেউ মনে করছেন, সরকার শিবির নির্মূলের রব তোলে ছাত্রলীগের খুন-সন্ত্রাস-দখলদারিত্বসহ নানা অপকর্মের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। সরকার যদি প্রকৃতপক্ষেই আন্তরিক হত তাহলে শিবির নির্মূলের অভিযানের সাথে সাথে ছাত্রলীগের খুন-সন্ত্রাস-দখলদারিত্বের বিরুদ্ধেও সাঁড়াশি অভিযান চলতো। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন ঘটনা ঘটেনি।

তাই, প্রতিটি সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক দল, সংগঠন, শক্তি বা ব্যক্তিকে আজকে উপলব্ধি করতে হবে যে, জামাত-শিবিরের মত ঘৃণ্য সন্ত্রাসী শক্তিকে আওয়ামী লীগ বা শাসকশ্রেণীভুক্ত কোনো দল বা সংগঠনের ওপর ভর করে নির্মূল করা যাবে না। এদের সবার অবস্থান জনগণের বিপক্ষে, সবাই নিপীড়ক এবং অত্যাচারী। আদর্শিকভাবেও এরা সবাই দেউলিয়া। এ কারণেই শিক্ষাঙ্গনসহ সর্বত্র এদের সংগঠন টিকিয়ে রাখা ও বিস্তারের প্রধান উপায় হল সন্ত্রাস আর দখলদারিত্ব। এই দখলদারিত্বের প্রয়োজনেই এরা একে অপরের ওপর হামলে পড়ে, এমনকি নিজেদের দলের ভেতরেও খুন-খারাবিতে লিপ্ত হয়, কখনও কখনও বিশেষ করে আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখলে সম্মিলিতভাবে প্রগতিশীল শক্তি বা সাধারণ ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর এদের এ সমস্ত সন্ত্রাসী তৎপরতার শিকার হয় কখনও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারুক হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু বকর সিদ্দিক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিউদ্দিনের মত মেধাবী ছাত্ররা।

আজকে বিভিন্ন কলেজে যে সরকারি ছাত্র সংগঠনের ভর্তিবাণিজ্য মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে – বিগত এক দশক ধরে যা ক্রমবর্ধমান হারে দেখা যাচ্ছে – তারও মূল কারণ ওই দখরদারিত্ব ও আদর্শিক দেউলিয়াত্ব। ছাত্রলীগ দাবি করতে পারে তারা মুজিববাদের সৈনিক, ছাত্র দল বলতে পারে তারা জিয়ার

আদর্শের সৈনিক। কিন্তু এ দু' আদর্শের স্বরূপ কী? গণতন্ত্র বা শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা? '৯০ এর আগ পর্যন্ত সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে এদের একটা ভূমিকা আছে ঠিক, কিন্তু সে আন্দোলনে কি তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অংশগ্রহণ করেছিল নাকি রাষ্ট্র ও জনগণের ওপর স্রেফ দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ছিল তাদের লক্ষ্য– গত দু'দশকের অভিজ্ঞতায় তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর শিক্ষার অধিকার? নৈব নৈবচ। কবে কোন প্রতিষ্ঠানে তারা শিক্ষার অধিকারের জন্য লড়াই করেছে? তাদের অতি বড় ভক্তও তা খুঁজে পাবে না। শিবির নিজেকে ইসলামের ধ্বজাধারি বলে দাবি করে থাকে। কিন্তু, এ এমন এক আদর্শ যা প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষাঙ্গনে ফ্যাসিবাদী কায়দায় দখলদারিত্ব কায়েম রেখে ভর্তি বাণিজ্য, তোলাবাজি চালাতে হয়, বিপরীত মতের ছাত্রদের হাত-পা কাটতে হয়, খুন করতে হয়। আর এদের এসব অপকর্ম দেখিয়ে বিশেষ মহল থেকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবি তোলা হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেক শুভবুদ্ধির মানুষও উপায়ান্তর না দেখে তাদের সাথে কণ্ঠ মেলান। কিন্তু, এতে যে, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের ভাষায়, স্নানের জলের সাথে শিশুকেও ফেলে দেওয়া হয় তা তারা ধরতে পারছেন না। (প্রথম আলো, ১৪ ফেব্রুয়ারি, '১০)

বাংলাদেশের মূল রাজনীতির মত ছাত্র রাজনীতিও শাসক শ্রেণীর পক্ষ-বিপক্ষ ধারায় বিভক্ত। এটা সবাই স্বীকার করবেন যে শাসক শ্রেণীর দলগুলোর মত তাদের পক্ষের ছাত্রসংগঠনগুলোতেও ব্যাপক দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে, যা আমরা ওপরে আলোচনা করেছি। কিন্তু, এর বিপরীতে বেশ কিছু ছাত্র সংগঠন আছে যাদের অবস্থান শাসকশ্রেণীর বিপক্ষে। তারা বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর সুনির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে ছাত্রদের সংগঠিত করে, শাসক শ্রেণীর শিক্ষাসহ জনস্বার্থবিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। এরা দেশাত্মবোধ ও সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা করে। আজকাল অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব আপোষহীন ধারার গৌরবোজ্জ্বল ছাত্ররাজনীতির কথা স্মরণ করে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। ওই ছাত্রসংগঠনগুলো সেই ধারারই উত্তরাধিকার বহন করে বুর্জোয়া প্রচামাধ্যমের ডামাডোলের মাঝে তারা হয়তো তা ধরতে পারছেন না। আমরা মনে করি, সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের দায়িত্ব ছাত্ররাজনীতির এ প্রগতিশীল ধারাকে সর্বাত্মক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বিকশিত করা। শিক্ষাঙ্গনে আজকে যে খুন, রাহাজানি, দখরদারিত্ব, টেন্ডারবাজি, ভর্তি বাণিজ্য চলছে প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে তা হয়ত কমিয়ে আনা যাবে, চিরতরে বন্ধ করা যাবে না। এগুলো চিরতরে বন্ধের জন্য প্রয়োজন এসবের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার প্রবল প্রতিরোধ। এ কারণেই আমরা ওই সব অপরাধের সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তির পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর আদর্শবাদী ছাত্ররাজনীতির বিপুল উত্থান চাই।

ছাত্র হত্যার বিচার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস-দখলদারিত্ব বন্ধের দাবিতে রাষ্ট্রপতি বরাবর ছাত্রজোটের স্মারকলিপি পেশ

কেন্দ্রীয় প্রগতিশীল ছাত্র জোটের উদ্যোগে ১৪ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে খুন-সন্ত্রাস-দখলদারিত্ব-সাম্প্রদায়িকতামুক্ত নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন, রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র হত্যার বিচারের দাবিতে রাষ্ট্রপতি বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এদিন বেলা ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি ফখরুদ্দিন কবির আতিক, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মানবেন্দ্র দেব, ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি আরিফুল ইসলাম ও ছাত্র মৈত্রীর যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রউফ।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে স্মারকলিপি প্রদানের উদ্দেশে বঙ্গভবনের দিকে যাওয়ার পথে পুলিশ শান্তিপূর্ণ মিছিলটি হাইকোর্ট মোড়ে বাধা দেয়। পুলিশী বাধার প্রতিবাদ করে সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এর পর ছাত্রজোটের একটি প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতি বরাবর স্মারকলিপি পেশ করার জন্য যান। স্মারকলিপিতে ৩টি সুনির্দিষ্ট দাবি উল্লেখ করা হয়।

১. খুন-সন্ত্রাস–দখলদারিত্ব–সাম্প্রদায়িকতামুক্ত নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক-কর্মচারীসহ সকলের জীবনের নিরাপত্তা দিতে হবে।

২. অবিলম্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফারুক হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু বকর সিদ্দিকসহ সকল ছাত্র হত্যার বিচার করতে হবে।

৩. আইন করে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার ও সকল ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। অবিলম্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু বকর হত্যা ও সন্ত্রাস-দখলদারিত্ব-সীট বাণিজ্যের প্রতিবাদে ৪ ফেব্রুয়ারি ও ৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে কলা ভবনের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ফখরুদ্দিন কবির আতিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেদী হাসান তমাল, মলয় সরকার, বিপ্লব মন্ডল ও স্নেহাদ্রী চক্রবর্ত্তী রিন্টু।

বগুড়া : ছাত্র জোট বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে ৭ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শহরের প্রধান প্রধান সড়কে মিছিল প্রদক্ষিণ করে সাতমাথায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট জেলা সাধারণ সম্পাদক কিবরিয়া হোসেন, জেলা ছাত্র ইউনিয়ন আহ্বায়ক যুথী রানী দাশ, দিলরুবা নূরী ও সমীর দাশ।

শাবিপ্রবি : ছাত্র জোট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ৭ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১২.৩০ মি. অর্জুনতলা থেকে মিছিল শুরু হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে গোল চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি কল্লোল চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট আহ্বয়াক কপিল রায়, গোলাম রাব্বী চৌধুরী, কাজল দাশ, সত্যজিৎ পুরকায়স্থ ও শুভাষিশ দাশ।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় : ছাত্র ফ্রন্ট বুয়েট শাখার উদ্যোগে ১২ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বুয়েট শাখার আহবায়ক গৌতক কুমার দে, জয় ভট্টাচার্য, রাজন।

কারমাইকেল কলেজ : ১১ জানুয়ারি বেলা ১২টায় ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ শাখার উদ্যোগে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ মিনারে এসে কলেজ শাখার সভাপতি আহসানুল আরেফিন তিতু'র সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পলাশ কান্তি নাগ, মনিরুজ্জামান মনির ও রোকনুজ্জামান রুকন।

ছাত্র জোটের সমাবেশে ছাত্রলীগের হামলার নিন্দা

ছাত্র ফন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ফখরুদ্দিন কবির আতিক এবং সাধারণ সম্পাদক জনার্দন দত্ত নান্টু এক যুক্ত বিবৃতিতে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ছাত্র জোটের মিছিল-সমাবেশে ছাত্রলীগের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে হামলাকারী ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করেন।

ইডেন কলেজে আন্দোলনরত ছাত্রীদের উপর ছাত্রলীগের হামলার বিচার ও ছাত্রীদের দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান

ইডেন কলেজে আবাসিক হলগুলোর ডাইনিং বন্ধ করে দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে কেন্টিন চালু ও খাবারের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং ইডেনে আন্দোলনরত ছাত্রীদের উপর হামলাকারী ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের বিচারের দাবিতে ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রগতিশীল ছাত্র জোট বিক্ষোভ মিছিল এবং সমাবেশ করে। বেলা ১২.৩০টায় মধুর কেন্টিন থেকে মিছিল শুরু হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে অপরাজেয় বাংলায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ফখরুদ্দিন কবির আতিক, ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি আরিফুল ইসলাম, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রউফ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মানবেন্দ্র রায়, পরিচালনা করেন ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মলয় সরকার।

ইডেন কলেজ : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস-দখলদারিত্ব, ইডেন কলেজের আবাসিক হলগুলোর ডাইনিংয়ে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রবেশ, খাবারের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং কলেজের আবাসিক শিক্ষার্থীদের ওপর গত ২৮ জানুয়ারি ছাত্রলীগের হামলার বিচার দাবি করে ছাত্র ফ্রন্ট ইডেন শাখার উদ্যোগে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল এবং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কলেজ শাখার সভাপতি তাপসী রাবেয়া আঁখি, সহ-সভাপতি আফসানা সুমী, সাংগঠনিক সম্পাদক সংগীতা বাড়ৈ ও তানিয়া আলম। সমাবেশ শেষে সভাপতির নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল উপাধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে।